তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় [১৮৯৮ – ১৯৭১]

শান্তিসুধা মুখোপাধ্যায়

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ২৩শে জুলাই বীরভূমের লাভপুর গ্রামে এক ক্ষয়িষ্ণু জমিদারবংশে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম হয়। পরবর্তীকালে, ব্যক্তিরূপে এবং লেখকরূপে, যা কিছু তিনি হয়ে উঠেছিলেন তার গোড়াপত্তন হয়েছিল তাঁর এই দেশ, কাল, ও পরিবারের মধ্যেই। তাঁর সমস্ত জীবনব্যাপী সাধনায় এই তিনের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ নিয়ে বিদগ্ধজনেরা নানা আলোচনা করেছেন। আর তারাশঙ্কর নিজেও তাঁর আত্মজৈবনিক উপন্যাস ধাত্রীদেবতায়, এবং দুটি স্মৃতিকথার (আমার কালের কথা ও আমার সাহিত্যজীবন) তার সবিস্তার বিবরণ দিয়েছেন, তাই তাঁর বহির্জীবন ও অন্তর্জীবনের মূল ইতিহাসটি আমাদের অজানা নয়।

যে পরিবারে তাঁর জন্ম হয়েছিল তাঁরা ছিলেন জমিদারির ছোট শরিক; অর্থাৎ তাঁদের ঠাটবাট ছিল, কিন্তু ঠাটবাট বজায় রাখবার মত অর্থ ছিল না। অপর পক্ষে যাঁরা বড় শরিক ছিলেন তাঁরা শুধু জমিদারি আয়ের ওপরেই নির্ভর না করে ব্যবসা বাণিজ্যেও লক্ষ্মীলাভ করেছিলেন। বর্ধিষ্ণু গ্রাম লাভপুরে উঠতি বিত্তবান আরও ছিলেন, সংলগ্ন কয়লাখনি অঞ্চল ছিল যাঁদের ভাগ্যপরীক্ষার ক্ষেত্র। আধুনিক যুগের এই উদ্যমে সামিল হবার ক্ষমতা তারাশঙ্করের বাবার ছিল না। আধুনিক শিক্ষাও তিনি সেভাবে পান নি। সামান্য বিষয়সম্পত্তি ও বংশগৌরব ছাড়া আর কোনো সম্বল তাঁর নেই এ দুঃখ তিনি বারবার পোষণ করেছেন। তাঁর মনের কথা তারাশঙ্কর জানতে পেরেছিলেন অনেক পরে। তাঁর পিতার অকালমৃত্যুর দীর্ঘকাল পরে একটা পুরনো ডায়েরি থেকে তিনি আবিষ্কার করেছিলেন পাঁচ বছরের ছেলের উদ্দেশ্য লেখা তাঁর আশীর্বচন - ''সরস্বতী মাতার অর্চনা আরম্ভ হইল। পুষ্পাঞ্জলি দেওয়ার পর তারাশঙ্করকে জিজ্ঞাসা করিলাম বাবা, মাকে প্রণাম করিবার সময় কি বলিলে? তাহাতে সে বলিল, 'আমি বলিলাম মা, আমাকে খুব বিদ্যা দাও, আমি ডাইনে বাঁয়ে ঢোল দিয়ে পূজা দিব। বড় হইয়া পূজায় যাত্রা করাইব। ধুম করিব।' শুনিয়া পুলকিত হইলাম। দেখ বাবা তারাশঙ্কর, জীবনে একথা যেন কোনোদিন ভুলিও না। অর্থের জন্য অনেক কষ্ট পাইয়াছি। পৈতৃক সম্পত্তি সত্বেও প্রতিষ্ঠা সম্মান রক্ষা দায় হইয়া উঠিয়াছে। বিদ্যাশিক্ষা করিয়া পৈতৃক সম্মান বংশপ্রতিষ্ঠাকে তুমি ফিরাইয়া আনিবে। বহু কীর্তি করিবে।'' পুত্রের কীর্তি তিনি দেখে যেতে পারেন নি। তারাশঙ্করের বয়স যখন মাত্র আট বছর তখন তাঁর মৃত্যু হয়।

সেই দুর্দিনে সংসারের হাস ধরেছিলেন মা ও পিসিমা। পৈতৃক বিষয়টুকু রক্ষা করে ছেলেমেয়েদের ভালোভাবে মানুষ করেছিলেন তাঁরা। পিসিমা ছিলেন বালবিধবা, প্রখর ব্যক্তিত্বশালী ও বুদ্ধিমতী। পরলোকগত ভাইয়ের সংসারটিকে তিনি পক্ষীমাতার মত আগলে রেখেছিলেন। আর তারশঙ্করের মা ছিলেন গভীর মনের এক ধৈর্যশীলা নারী। পাটনার এক শিক্ষিত ও স্বদেশানুরাগী পরিবার থেকে বধুরূপে তিনি লাভপুরে এসেছিলেন এবং আপন শিক্ষাদীক্ষা ও মার্জিত রুচিতে পল্লীগ্রামের এই বাড়ির চেহারা বদলে দিয়েছিলেন। দুর্ভাগ্যবশত : তাঁর সে সংসারজীবন দীর্ঘস্থায়ী হল না। কিন্তু গভীর যত্নে তিনি ছেলেমেয়েদের বড় করতে লাগলেন, বিশেষ করে বড় ছেলে তারাশঙ্করকে। তাকে তিনি দীক্ষা দিলেন ভিন্নতর মূল্যবোধে, সাহিত্যে, স্বাজাত্যবোধে। অল্পবয়সে পিতৃহীন হয়ে বিষয়সম্পত্তির মালিক হয়েছেন বলে কোনওরকম ঔদ্ধত্য তিনি ছেলের মনে জন্মাতে দেন নি। বরং স্কুলে পড়তে পড়তেই তারাশঙ্কর যখন সমাজসেবার কাজে যুক্ত হলেন, মহামারী বা অগ্নিকাণ্ডের মত দৈবদুর্বিপাকে দলবল নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগলেন দরিদ্র অন্ত্যজ পল্লীতে, মায়ের তাতে সম্পূর্ণ সম্মতি ছিল।

তখনও পর্যন্ত লেখক হবার কোনো স্থিরসংকল্প তারাশঙ্করের ছিল না। দুটো বিয়ের পদ্য লেখা, বা পাড়ার ক্লাবে অভিনয়ের জন্য নাটক লিখে দেওয়া সাহিত্যকর্ম নয়। কিন্তু নিজের অজান্তেই তিনি তাঁর ভবিতব্যের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন অন্যভাবে - তা হল নানারকম মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের দ্বারা। তখনও পর্যন্ত বাংলার ঐ প্রত্যন্ত পশ্চিমাঞ্চলে নানা আদিম জনজাতির বাস ছিল। বা আনাগোনা ছিল। সাপ, ছাগল, বাঁদর নিয়ে খেলা দেখিয়ে বেড়ানো বেদের দল ছিল যারা ধর্মে হিন্দু ও মুসলমান একসঙ্গে দুটোই। ছিল পটচিত্র নিয়ে গান গেয়ে বেড়ানো পটুয়ার দল। ভিন্ন রুচি ভিন্ন চেহারার পরিচ্ছন্ন সাঁওতাল বসতি ছিল কাছেই। ছিল আখড়ার মধ্যে অন্তরীন গীতপ্রিয় মধুরভাষী বৈষ্ণবসমাজ। ডোম ও বহুবিধ অন্ত্যজ জাতির পাড়া ছিল গ্রামের মধ্যেই। যাদের আদিম চরিত্র মাঝে মধ্যে ফুটে বেরোত নিজেদের মধ্যে দাঙ্গাহাঙ্গামায়। এইসব মানুষজনের সঙ্গে শিক্ষিত ভদ্রসন্তানদের সাধরণত: কোনো পরিচয় থাকে না। কিন্তু সমাজসেবার সূত্রে তারাশঙ্করের সঙ্গে এদের বিশেষ প্রীতির সম্পর্ক ছিল। কিশোর বয়সে যখন পর্যন্ত মানুষের মনে শ্রেনীস্বার্থবুদ্ধি জাগে না তখনই তিনি এদের সংস্পর্শে এসেছিলেন এবং কাঁচা মনের সাগ্রহ আন্তরিকতায় এদের ভালোবেসেছিলেন। সেই ভালোবাসা ছিল উভয় পক্ষেই। এবং তারাশঙ্কর আজীবন তা পেয়েও এসেছেন। এরা কী খায়, কী পরে, কোন অবস্থায় কিভাবে মনোভাব ব্যক্ত করে, এদের সাধ আহ্লাদের জগৎটা কেমন সব তাঁর জানা ছিল। তারই সঙ্গে যাঁরা তাঁর স্বশ্রেনীর লোক সেই গ্রামীন ভদ্রসমাজকেও তিনি পর্যবেক্ষণ করেছিলেন পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে। জ্ঞাতিবর্গের মধ্যে কারও অবস্থা অপেক্ষাকৃত হীন হলে তার আত্মাভিমান ও স্পর্শকাতরতা বেশী তীক্ষ্ণ হয়। তারাশঙ্করেরও তা হয়েছিল। এইভাবে অল্পবয়সেই একটা বিশাল অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার তাঁর তৈরি হয়ে গিয়েছিল যা স্বভাবধর্মে তাঁর সহরবাসী সতীর্থদের থেকে আলাদা।

লাভপুর থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তারাশঙ্কর কলকাতায় পড়তে এলেন, ভর্তি হলেন সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে। কিন্তু ইন্টারমিডিয়েট পর্ব শেষ হবার আগেই এমন একটা ঘটনা ঘটল যাতে তাঁর জীবনের গতিপথটাই গেল বদলে। শহরের হালচাল সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ তারাশঙ্কর নিজের অজান্তেই গুপ্ত বিপ্লবী দলের কিছু ছেলের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছিলেন। উগ্রপন্থায় তাঁর কোনোদিনই আস্থা ছিল না, সেদিন নয়, পরেও নয়, কিন্তু সঙ্গীদের তিনি ঠিক চিনে উঠতে পারেন নি। তখন ইংরেজ সরকারের দমননীতি কঠিন থেকে কঠিনতর হচ্ছে। সন্দেহের অঙ্কুর দেখা দিলেও তা নষ্ট করা হচ্ছে নির্মমভাবে। অচিরে তারাশঙ্কর গোয়েন্দার নজরে পড়লেন। প্রমাণাভাবে অন্য শাস্তি হল না, তবে গ্রামের বাড়িতে অন্তরীন হয়ে যেতে হল। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে এই যে বাধাটা পড়ল খুব শীঘ্র তা কাটল না। ফলে তাঁর কলেজী শিক্ষা ওখানেই থেমে গেল। তাঁর কল্লোলীয় সতীর্থদের মতো বিশ্বসাহিত্যের প্রসাদ তিনি পেলেন না, বিবিধ বিদ্যাচর্চাজাত নাগরিক পরিশীলনও তাঁর অধরা রয়ে গেল। এজন্য নাগরিকের চোখে গ্রামীণ অপবাদ তাঁকে চিরকাল সইতে হয়েছে। তবে আর এক দিক থেকে এই অবস্থান্তর তাঁকে লেখক হবার পথেই অনিবার্যভাবে ঠেলে দিল। ইংরেজ সরকার ভেবেছিল এই তরুণবয়স্ক জমিদারনন্দনটিকে গ্রামের চৌহদ্দির মধ্যে আটকে রাখলে আস্তে আস্তে তার ভিতরের আগুন নিয়ে যাবে। কিন্তু বাস্তবে তা হল না। বরং কলকাতা প্রত্যাগত তারাশঙ্কর অধিকতর দৃঢ়সংকল্প হলেন। তাঁর বহির্মূখী চঞ্চল মন অন্তর্মুখে সংহত হল। ইতিমধ্যে তাঁর অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারে আর একটি সংযোজন হয়েছে। খনি অঞ্চলের অভিজ্ঞতা। তাঁর শ্বশুরকুলের আগ্রহে ও উদ্যোগে তিনি কয়লাখনিতে চাকরি করতে গিয়েছিলেন। সেখানে গিয়ে বুঝেছেন এ বৃত্তি তাঁর জন্য নয়। অতএব মাসকয়েক পরেই তিনি ফিরে এলেন। এদিকে সংসারের চাহিদা তখন ক্রমবর্ধমান। ক্ষুদ্র জমিদারির সমস্যা দিনে দিনে যত বাড়ছে বাঁধা আয়ও ততই কমছে। তাছাড়া আজকাল তাঁর এও মনে হয় যে এ পরশ্রমনির্ভর জীবন অমর্যাদাকর। অতএব নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে এবং লেখকরূপেই দাঁড়াতে হবে।

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় শতক শেঘ হতে চলল, ইতিমধ্যে কলকাতা শহরে বিদ্রোহের ধ্বজা উড়িয়ে নব যুগের সাহিত্যিকরা এসে গেছেন। কল্লোল, কালিকলম, প্রভৃতি পত্রিকা তাঁদের মুখপত্র। রবীন্দ্রপ্রভাবের সর্বব্যাপী জাল কেটে বেরোবার জন্য তাঁরা উদগ্রীব। বেরোতে না পারলে তাঁদের সাহিত্যিক অস্তিত্বই থাকবে না। অরাবীন্দ্রিক বিষয়বস্তুর সন্ধানে তাঁরা কথাসাহিত্যের উপাদান খুঁজছেন শহর ও শহরতলির বস্তিজীবনে, অথবা নিম্নমধ্যবিত্ত বাঙালীর দুঃসহ সংসারযাত্রায়, এবং অবশ্যই ফ্রয়েডিয় তত্বে। কিন্তু নগরবৃত্তের বাইরে বঙ্গদেশের প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতে যে বিচিত্র জীবনধারা বইছে সেদিকে তাঁদের আগ্রহ ছিল না, (একমাত্র ব্যতিক্রম শৈলজানন্দের কয়লাকুঠির গল্প) কারন সেখানকার সঙ্গে তাঁদের পরিচয় ছিল না। আর তারাশঙ্করের সেটাই ছিল অপর্যাপ্ত।

সৃষ্টিসন্ধান

প্রথম যে গল্পটি লিখে তারাশঙ্করে সাহিত্য - সমাজে পরিচিত হলেন তার নাম রসকলি। গল্পটি লিখেছিলেন তিনি প্রবাসীর জন্য। কিন্তু অনেকমাস কেটে গেলেও কোনও সাড়াশব্দ না পেয়ে তিনি প্রবাসীর দপ্তর থেকে গল্পটি ফিরিয়ে আনেন এবং কল্লোল পত্রিকার অফিসে দিয়ে আসেন। সমবয়সী হলেও এই লেখককুলের সঙ্গে তাঁর তখনও পরিচয় হয়নি। পরের মাসেই রসকলি কল্লোলে প্রকাশিত হলো, সঙ্গে এলো পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের একখানি চিঠি - ''আপনি এতদিন চুপ করিয়া ছিলেন কেন?''

১৯২৭-২৮ খৃষ্টাব্দ থেকে রচনার এই যে ধারা শুরু হল তা আর থামে নি। কল্লোল সহ কলকাতার অন্য পত্রিকাগুলিতে তাঁর রচনা প্রকাশিত হতে থাকল। স্বাদের নতুনত্বে তা গুণিজনের প্রশংসা পেল, এমন কি রবীন্দ্রনাথেরও। আবার নিন্দিতও হলেন সাপখোপ ডাইনি বেদে গুনিনদের নিয়ে 'গ্রামীন' লেখা লিখেছেন বলে। ততদিনে তারাশঙ্কর কলকাতায় এসে থাকতে আরম্ভ করেছেন, কারন সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল থেকে দূরে লাভপুরে পড়ে থাকলে সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠা তিনি পাবেন না। কিন্তু লেখক হিসাবে স্বীকৃতি যতই জুটুক অর্থভাগ্য ফিরছে না। ব্যয়সংকোচের জন্য টিনের ঘরে থাকেন, যৎসামান্য আহার করেন। তবু টাকার অভাবে স্ত্রী কন্যার চিকিৎসা হয় না। গল্প লিখে পাঁচ দশ টাকা পান, তাও সবসময় সঙ্গে সঙ্গে নয়। প্রথম উপন্যাস চৈতালি ঘূর্নি (১৯৩১) নিজ ব্যয়ে প্রকাশ করেছেন। প্রশংসা পেয়েছেন, কিন্তু আশানুরূপ বিক্রি হয় নি। তখন তাঁর খুবই দু:সময়। এমন দিনও গেছে যখন মাত্র একশো টাকায় গ্রন্থস্বত্ব বিক্রি করেছেন। সেই দুর্দিনে তিনি ভালো একটি চাকরির প্রস্তাব পেয়েছিলেন। হিমাংশু রায় তখন বম্বে টকিজ খুলেছেন। সেখানে ফিল্মের গল্প লেখবার জন্য তিনি ভালো লেখক খুঁজছিলেন। শুনে দীনেশচন্দ্র সেন তারাশঙ্করের নাম সুপারিশ করেছিলেন। এ চাকরি কিন্তু তারাশঙ্কর নিলেন না, কারণ কলকাতা ছেড়ে ফিল্মের কাজে বোম্বাই চলে গেছে তাঁর আসল লেখা আর হবে না। তাই অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মুখ চেয়ে কষ্ট সহ্য করে তিনি কলকাতাতেই পড়ে রইলেন, বোম্বাই গেলেন না। সেই দুর্দিনে তাঁকে বন্ধুবর সজনীকান্ত দাস অনেক সাহায্য করেছিলেন।

এইভাবে তিল তিল করে বছরের পর বছর ধরে তারাশঙ্কর তৈরি করলেন তাঁর পায়ের নিচের জমি। ক্রমে নাম, যশ, অর্থ, প্রতিপত্তি, পাঠকের ভালোবাসা, সরকারি সম্মান সবই তাঁর হল, জ্ঞানপীঠ পুরস্কারও পেয়েছিলেন গণনদেবতা উপন্যাসের জন্য। জীবনের শেষ পঁচিশ বছর তিনি এইসব পেয়েছিলেন। তবে উপার্জনের তাগিদে তাঁকে সাধ্যের অতিরিক্ত লিখে যেতে হয়েছে চিরকাল। একে তো বৃহৎ পরিবার প্রতিপালনের দায়িত্ব ছিল। তাছাড়া পরিবারবহির্ভূত নানা দায়দায়িত্ব এবং দানধ্যানও তাঁর ছিল। এই অবিশ্রাম লেখনীচালনা তাঁর মনের আনন্দ হরণ করেছে। কমিয়ে দিয়েছে জীবনীশক্তি! তাঁর বিপুল রচনার অনেকখানিই গুণগত মানে খুব উঁচুদরের হয় নি। কালের বিচারে হয়ত সেগুলি ঝরে যাবে। তবু এ সব ঝড়তিপড়তি বাদ দিয়ে তাঁর যে শ্রেষ্ঠ রচনাগুলি থাকে সেগুলিতে তাঁর প্রতিভার দীপ্তি আলোর মত জ্বলছে। তাদের সংখ্যাও নেহাত কম নয়।

তারাশঙ্করের প্রতিনিধিস্থানীয় উপন্যাসগুলির মধ্যে পড়ে ধাত্রীদেবতা, কালিন্দী, গণদেবতা, পঞ্চগ্রাম, কবি, পদচিহ্ন, হাঁসুলি বাঁকের উপকথা, আরোগ্যনিকেতন, মঞ্জরী অপেরা, অরণ্যবহ্নি প্রভৃতি। আর আছে অজস্র ছোটগল্প - নারী ও নাগিনী, বেদেনী, জলসাঘর, রায়বাড়ি, কামধেনু, ইমারত প্রভৃতি, সংখ্যায় যত বিপুল বৈষয়বৈচিত্র্যে ততোধিক। এইসব রচনার মধ্যে দুটি মূল ধারা ক্রিয়াশীল। একদিকে আছে তাঁর নিজ গ্রামে শৈশবে দেখা নানারকম মানুষের ছবি। সেই সব জনজাতির আজ অধিকাংশই লুপ্ত হয়ে গেছে, অথবা জাতিবৈশিষ্ট্য হারিয়ে মিশে গেছে মূলস্রোতে। তাদের স্মৃতি ধরা রইল তারাশঙ্করের রচনায়। দ্বিতীয় যে ধারা, এবং সেটাই প্রধান, সেখানে আছে আমাদের রাজনৈতিক সামাজিক, অর্থনৈতিক জীবনে যুগান্তরের ইতিহাস। বিলীয়মান সামন্ততন্ত্রের উপর ধনতন্ত্রের অভিঘাত তিনি দেখেছেন। এরই মধ্যে দেখেছেন অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সর্বহারার লড়াই। এই মৌল দ্বন্দ্বের ভেতরে যে কত উপশ্রেণী আছে। কতরকমের শ্রমজীবী মানুষ আছে, চাষীই হোক, আর কলকারখানার কুলিই হোক, সবার মধ্যেই নিত্যপরিবর্তমান জীবনসংগ্রামের যে কতরকম বৈচিত্র্য আছে তা তিনি ধরেছেন আশ্চর্য সামগ্রিকতায়। আমাদের দেশে মার্কসবাদ ভালোভাবে পৌঁছবার আগেই তিনি নিজের মত করে বুঝে নিয়েছেন শ্রেনীসংগ্রামের তত্ত্ব। মার্কসবাদীদের কেতাবি ব্যাখ্যার সঙ্গে তা মেলেনা। তাদের দলেও তিনি যোগ দেন নি। এই অপরাধে তাঁকে অনেক নিগ্রহ সইতে হয়েছে। তাঁর রচনার অপব্যাখ্যাও হয়েছে প্রচুর, তারাশঙ্কর বরাবর নিজের বিশ্বাসেই স্থির থেকেছেন। কারণ তাঁর বক্তব্য ছিল তাঁর নিজের অভিজ্ঞতাসঞ্জাত।

তারাশঙ্করের কালিন্দী উপন্যাস বেরিয়েছিল ১৯৪০ সালে। তখন তাঁর প্রতিভার মধ্যগগন। সেই উপন্যাসে দেখি কালিন্দী নদীর দুপাশে দুই জমিদারের এলাকা। মাঝখানে নদীর বুকে একটি চর জেগেছে। দুপক্ষ মনে করে ঐ চরভূমি একমাত্র তারই সম্পত্তি। বিবদমান জমিদারদের একজনের ঘরে জন্ম নিয়েছে এক ব্যতিক্রমী সন্তান, যে সাম্যবাদে বিশ্বাসী এবং বিপ্লবের জন্য উৎসুক। গরিব সাঁওতালেরা তাকে প্রাণতুল্য ভালোবাসে। কিন্তু সে কিছু করে ওঠবার আগেই তাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায় রাজপুরুষেরা। কিন্তু জমিদার দুজন চরের দখল পেলেন না। চর অধিকার করে নিল শ্রমজীবী সাঁওতালের দল। কঠোর পরিশ্রমে তারা মাটির ঘুম ভাঙাল, দ্বীপ জুড়ে ফুটে উঠল লক্ষ্মীশ্রী। উপন্যাসটি এখানেই শেষ হলে মন্দ হত না। তাহলেও একরকম ব্যাখ্যা পাওয়া যেত যা সাম্যবাদী ভাবাদর্শের অনুগত এবং প্রাকবিপ্লব রুশ উপন্যাসের অনুযায়ী। সাঁওতালরা জয়ী হয়ে গেলে লেখক নিজেও কম খুশি হতেন না কারণ সারা উপন্যাস জুড়ে তাঁর অন্তরের সমর্থন ছিল এদের দিকেই। কিন্তু প্রকৃত উপন্যাস ইচ্ছাপূরনের গল্প নয় বাস্তবতার দলিল। তাই দেখা যায় দ্বীপ যখন বাসযোগ্য হয়েছে তখন সেখানে আবির্ভূত হল চিনিকলের লোকজন। তাদের পিছনে অলক্ষ্যে আছে রাজশক্তি। তাদের কূটনীতির কাছে হেরে গেল শ্রমিক ও সামন্ত দুই পক্ষই। ওখানে বসল কারখানা। কিছু কৃষক হল মজুর। বাকিদের ঝাঁটিয়ে ফেলে দেওয়া হল ইতিহাসের আবর্জনাস্তূপে। এই উপন্যাসের জন্য তারাশঙ্কর প্রগতিশীলদের চোখে প্রতিক্রিয়াশীল বলে নিন্দিত হয়েছিলেন। কিন্তু আজ এই একবিংশ শতাব্দীতেও কি ইতিহাস কিছু পালটেছে? আজ আমরা যাকে শিল্পায়ন বলি সেটাও কি প্রকারান্তরে কালিন্দিচরের ইতিহাস নয়? নতুন ব্যবস্থায় তারাশঙ্করের অন্তরের সমর্থন নেই। তাঁর সহানুভূতি পরাজিত সামন্তপ্রভু, তাদের বিপ্লবী আদর্শবাদী সন্তান, এবং সর্বোপরি সাঁওতালদের জন্য। তিনি জানেন বাস্তবজগতে এদের এখন হেরে যাবারই যুগ। কালের এই গতি তিনি রোধ করতে পারবেন না। তাই ছাব্বিশ খণ্ড তারাশঙ্কর রচনাবলী জুড়ে এ ব্যাপার বরাবর ঘটে। কীর্তিহাটের মৌজা বিশ্বম্ভর রায়ের হাতছাড়া হয়ে চলে যায় মহিম গাঙ্গুলির অধিকারে, হাঁসুলি বাঁকের কাহাররা ছন্নছাড়া হয়ে কে কোথায় ছিটকে পড়ে; বাঁশঝাড়ের আড়ালে ঢাকা কালারুদ্রের থান কেটে কুটে পরিষ্কার করে সেখানে গড়ে ওঠে অস্থায়ী সেনানিবাস; অক্ষম অভিমানে ন্যায়রত্ন ঘরের ভিতর মুখ লুকোন, রাজপুরুষকে ফুল দেবেন না বলে গৌরীকান্ত কেটে ফেলেন তাঁর সখের গোলাপগাছ; জীবনমশায়রা চিকিৎসা ছেড়ে দেন।

তবে কি বলব কাল ও কালান্তরের লীলা দেখাতে গিয়ে তারাশঙ্কর একজন নেতিবাদী লেখকে পরিণত হয়েছিলেন। আদৌ তা নয়। সমাজের যারা দুর্বলতর শ্রেণী, শিক্ষা, বর্ণ এবং আর্থিক অবস্থায় যারা নীচু স্তরের লোক সেখানে তিনি নবযুগের সূচনা দেখেছেন - ''আমার সেকাল এবং একালের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব নেই। চিরকল্যানের একটি ধারাই আমি তার মধ্যে দেখতে পাই। কোনোকালে ওপারে ফুটেছে ফুল, কোনোকালে এপারে ফুটেছে ফুল। আমি সকল কালের সকল ফুলের মালা গেঁথেই পরাতে চাই মহাকালের গলায়'' (আমার কালের কথা) তিনি দেখতে পান আমাদের পুরনো শ্রেণীবিভক্ত সমাজের বদল হচ্ছে; শ্রেণীছকগুলি বদলে যাচ্ছে ক্রমাগত। নতুন যুগের গণঅভ্যুত্থানের রূপরেখা তিনি এঁকেছেন তাঁর নিজের বিশ্বাসের অনুগামী করে। গণদেবতা পঞ্চগ্রাম যুগ্ম উপন্যাস জুড়ে আমরা এইরকম একজন অভ্যুত্থানের নায়ককে দেখতে পাই। দেবু ঘোষ চাষির ছেলে। কিন্তু তার বৃত্তি পাঠশালার পণ্ডিতি। সে বিশ্বাস করে বিদ্যার শক্তিতে এবং মানুষের মর্যাদায়। তাই সমাজকে অস্বীকার না করেও, তার মধ্যে, তাকে মান্য করে বাস করতে করতেই সে তিলে তিলে আদায় করে নেয় মনুষ্যত্বের স্বীকৃতি। নিজের জন্য, এবং অন্যের জন্যও। পঞ্চগ্রাম উপন্যাসের শেষে যখন দেবুর নেতৃত্বে গ্রামের আপামর জনগন ময়ূরাক্ষীর বিধ্বংসী বানের মুখে দাঁড়িয়ে বাঁধ মেরামত করে, বান রুখে দেয়, তখন তারাশঙ্কর দেখিয়ে দেন ভারতীয় সমাজপরিবেশ ঐতিহ্য, সংস্কার ও আস্তিক্যবুদ্ধির মধ্য থেকেই কেমন করে উদগত হয় যুগান্তর।

অতুলচন্দ্র গুপ্ত তারাশঙ্করকে বলেছিলেন ''বঙ্গসরস্বতীর খাসতালুকের প্রজা। বহুকর্মময় জীবনের অন্তে ১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে যখন তাঁর মৃত্যু হল ততদিনে তাঁর এই অভিধা চিরকালের স্বীকৃতি পেয়ে গেছে।

সৃষ্টিসন্ধান